প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের সূচনায় লিখেছিলেন তাঁর আপন কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে, "আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু জোগান নূতন পথ নেয়।" [১] কেবল রবীন্দ্র কাব্যে নয় বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসেও ঋতুবদল ঘটেছে বারে বারে। সব দেশের কাব্যের ইতিহাসেই এমন ঋতুবদল হয়। তাই দিয়েই কাব্যের যুগ চিহ্নিত হয়। বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতককে মহাকাব্যের যুগের সঙ্গে সঙ্গে 'রূপক কাব্যের' যুগও বলা যেতে পারে। সবচেয়ে বেশী এবং সার্থক শ্রেষ্ঠ 'রূপক কাব্য' এই সময়েই রচিত হয়েছিল। কবি মৌমাছিগণ ফুলের ফসল বদলের সাথে সাথে মধু আহরণের নূতন পথ বেছে নিয়েছিলেন 'রূপক প্রথার' আশ্রয় গ্রহণ করে। মহাকাব্য, আখ্যায়িকাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্যের মত 'রূপক কাব্য'ও ঋতুবদলের ফসল হিসেবে উপস্থিত হ'ল বাংলা সাহিত্যে এই শতাব্দীতেই।

"হিন্দু শাস্ত্র বলেন, মানুষ এক জন্মের দেহ ত্যাগ করে গ্রহণ করে নূতন জন্মের দেহ। তেমনি মানুষের মন ধরা দেয় নব - নবায়মান পরিবর্তনশীল সংস্কারে ভাবনায় দিনচর্যায়, শিল্পকৃতিতে, সাহিত্য ও দর্শন সাধনায়, পর্বে পর্বে প্রাণ আপন আবরণ যেমন রচনা করে তেমন মোচনও করে। সাহিত্যে বিশেষ করে কাব্যে প্রাণের এই নব নব রূপান্তর প্রতিভাত হয়।" [২] 'রূপক কাব্য' প্রাণের এই নানা রূপান্তরের অন্যতম উপকরণ।

১। নবজাতক কাব্যগ্রন্থ | সূচনা।
২। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সঙ্কলন | ভূমিকা, ১৯৫১।

গীতিকাব্যেই বাঙালি মানসের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, আর রূপককাব্যের পথ বেয়েই নীতিপ্রাণতার উৎসার ।

অর্থের সঙ্গে ধ্বনির স্বরগৌরী মিলনে কাব্যের যথার্থ সিদ্ধি । ভাব ও ভাবনায় থাকলেও ধ্বনির আলাপ পাঠককে পৌঁছে দেয় রসলোকে । রূপক অলংকার ধ্বনি রচনার সবচেয়ে উপযোগী সহায়ক । রূপক কাব্যের মধ্যে অন্য একটা ভাবের অনুভূতি জাগিয়ে দিয়ে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে । ব্যঞ্জনাই ধ্বনি । আর ধ্বনিময়তাই কাব্যের প্রাণ । এই কারণে রূপক ধর্মী সার্থক কাব্যমাত্রেরই লক্ষণ মনে হয় ।

সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রবণতায় এই 'রূপক'-প্রতিমার জন্ম । উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের সাদৃশ্য ও অভেদত্ব কল্পনায় সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস প্রাচীনতম কাল থেকেই বিভিন্ন দেশ-বিদেশের সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, শিল্পকলায় লক্ষ করা যায় । কিন্তু এ সবই অলংকার রূপক । অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে পরম্পরিত রূপক বা সাঙ্গরূপক বলা হয় – তাকে ভিত্তি করে বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে যে 'রূপককাব্য' গড়ে উঠেছিল তা বেশী পুরানো নয় । বলা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়ার্ধে 'সাঙ্গরূপক কাব্য' (যাকে ইংরাজীতে Allegorical Poems বলা হয়) চর্চার একটা বিশেষ প্রবণতা বাঙালী কবিগণের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। দ্বারকানাথ অধিকারী, বলদেব পালিত, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, হেমচন্দ্র - বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীগণ 'রূপককাব্য' লেখার প্রয়াস পেয়েছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যৌবনের প্রারম্ভে পূর্ববর্তীদের অনুসরণে কাহিনী-কাব্য লেখায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের পর আর কেউ 'রূপককাব্য' লেখেন নি । এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে আলোচ্য কাব্যধারাটি ধীরে ধীরে মহাকাব্যের মত মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ।

কেন এই বিশেষ পর্বে রূপক কাব্যধারার সূত্রপাত হয়েছিল এবং কেনই বা অতিক্রান্ত কালের মধ্যে সেই ধারাটি অবলুপ্ত হয়ে গেল তার বিশদ আলোচনায় বর্তমান গবেষণা

নিবন্ধের উদ্দেশ্য স্বরূপ। প্রসঙ্গতঃ বাংলা রূপক কাব্যগুলির সবিস্তার বিশ্লেষণও এই গবেষণা নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

'' কবির একটি নিজস্ব জগত আছে। সেই জগত যেমন তাঁর নিজের সৃষ্টি, কবিতার পাঠক পাঠিকাদেরও তেমনি নিজেদের অনুভূতির জগৎ সৃষ্টি করে নিতে হয়, সেই রূপ পথেই তার স্থিতি, তার আবাহন ও বিসর্জন, তাতেই তার সার্থকতা, পাঁচের দরবারে সেটা বাহ্য হলেও নিজেদের অন্তরের মাধুরীতে তা গ্রাহ্য।''[৩] – এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমার গবেষণাকার্যে অগ্রগমন। কেননা এ পর্যন্ত 'রূপককাব্য' সম্পর্কে কোন বিস্তৃত বা সর্বাঙ্গীণ আলোচনা হয় নি। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একদিকে মহাকাব্য, আখ্যায়িকাকাব্য অন্যদিকে খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্যের যোজক হিসেবে রূপক কাব্যধারার বিশেষ মূল্য ছিল। কিন্তু অধুনা আলোচ্য কাব্যধারাটি সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্মৃত প্রায়। এই কাব্যধারাটির পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই আমার গবেষণা কার্যে হস্তক্ষেপ।

আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধটিতে প্রথমতঃ আমি রূপকের সংজ্ঞা ও তার তত্ত্বগত পরিচয় দিতে চেয়েছি। প্রসঙ্গতঃ মানব মনস্তত্ত্বের রূপক প্রবণতার স্বতঃস্ফূর্ততার কথা বলেছি। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কথা। দেখেছি সেখানেও রূপকের ব্যবহার সহজলভ্য ও অফুরন্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য আলোয় বাংলা সাহিত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, 'রূপককাব্য' তারই ফলশ্রুতি কিনা তা আলোচনার অবকাশ রচনা করে। প্রসঙ্গতঃ মনে আসে সংস্কৃত সাহিত্যে রচিত রূপকরচনার কথা। সুতরাং রূপক কাব্য 'আলোচনা প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে বাংলা সাহিত্যে যে 'রূপককাব্য' রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল তা কোন আদর্শে রচিত। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ ঈশ্বর গুপ্ত অনূদিত 'বোধেন্দু বিকাস' নাটকের রূপকত্ব নির্ণয় এবং ১৮৫৫ সাল

৩। [illegible] । [illegible], ১০৬৬, [illegible]।

থেকে ১৮৮৯ সালের বিভিন্ন সময়ে রচিত রূপক কাব্যগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে ।

এখানেই আলোচনা থেমে থাকে নি । আলোচনা এগিয়ে গেছে রূপককাব্যের অবলুপ্তির কারণ সন্ধানে । বাংলা কাব্য সাহিত্যে গীতিকাব্য পূর্ণাঙ্গ ও পরিপুষ্ট । অথচ 'রূপক কাব্য' গীতিকাব্যের পূর্ববর্তী হওয়া সত্ত্বেও অপূর্ণাঙ্গ ও দুর্বল । তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে এবং প্রমাণভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছি বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে গীতি কবিতার বিলম্বিত আবির্ভাবের ফলেই সাহিত্যক্ষেত্রে রূপককাব্যের ফসল ফলেছিল । আবার সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে গীতিকাব্য এমনভাবে শাখা প্রশাখা বিস্তার করল, রূপককাব্যের অন্তরে প্রবেশ করে তাকে জীর্ণ ও দুর্বল করে দিল, তার রস শোষণ করে বিলুপ্তির অতল গভীরে নিমজ্জিত করে দিল ।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির জাতীয় জীবনে সর্বব্যাপী সংগঠনযজ্ঞ শুরু হয়েছিল । বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে যুগব্যাপী জড়তা ও কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করা হচ্ছিল । তারই ফলে দেশের আকাশে বাতাসে একটা সুতীব্র আবেগ ও উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছিল । সেই আবেগ ও উন্মাদনা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন খুব স্বাভাবিক কারণেই গীতিকবিতা হতে পারে না । গুরুভার বহনক্ষম আখ্যায়িকা কাব্যই সে আবেগ ও উন্মাদনার যোগ্য আশ্রিত হতে পেরেছিল । গীতিকবিতা রচনার জন্য যে প্রশান্তি ও ধ্যানের অবসর প্রয়োজন তা সেই দায়িত্ব ভারাবনত পরিবেশে লাভ করা সম্ভব ছিল না । জাতীয় জীবনে শান্তি ও স্থিতি ও এর সঙ্গে অন্তর্মুখী জীবনচর্চা না এলে গীতিকবিতা সর্বহৃদয় সম্বাদী হয়ে উঠতে পারে না বলেই এই পর্বে গীতি কবিতার আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছিল ও তার পদক্ষেপে দ্বিধা ও কুণ্ঠা লক্ষ্য করা গিয়েছিল । কিন্তু যখন অস্ত্রের ঝনৎকার, যুদ্ধযাত্রার উন্মাদনা, যুদ্ধজয়ের উল্লাস স্তিমিত হয়ে এল, অথচ প্রশান্তির এল না, কবিরা উপলব্ধি করলেন জাতীয় মানসিক বিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, তখনই গ্রহণ করলেন

রূপকের আঙ্গিক । সাল - তারিখ সাজিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, মহাকাব্যের ধারা আর গীতিকাব্য ধারার মধ্যে একটি সংকীর্ণ যোজকের কাজ করেছিল বাংলা সাহিত্যে রূপক - কাব্যের ধারা । বাহ্যার্থের অন্তরালে গোপন রাখলেন জাতীয় মানসিক শুদ্ধির মন্ত্র । রূপক রচনা প্রথা হিসেবে দেখা দিল ।

রূপক কাব্যের কবিগণ — নীতিকে প্রচ্ছন্ন রাখলেন রূপকের অন্তরালে । কিন্তু নীতিকে ছাড়িয়ে প্রথাকে অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্যে একটিমাত্র বিশুদ্ধ রূপককাব্য লেখা হয়েছিল — সেটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) । কবির হৃদয়রসের এমন এক চেতনায় জড়িত যার সম্বাদ পাঠক মনের মণিকোঠার ভিতরমহলে সাড়া জাগায় । 'স্বপ্নপ্রয়াণ' — একম্ অদ্বিতীয়ম্ পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন একখণ্ড দ্বীপের মত হলেও আসলে পূর্ববর্তী কবিদের প্রয়াসের পূর্ণতম চূড়ান্ত ফসল এই কাব্য । দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিপ্রতিভায় দার্শনিকতা ও বিশুদ্ধ কবিত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছিল । সেকারণে প্রথাকে অনুসরণ করা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ নান্দনিক কাব্যরচনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল । পরবর্তীতে উপযুক্ত ধারকের অভাবে আর বিশুদ্ধ রূপককাব্য রচিত হয় নি । উপরন্তু গীতি কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততা ধীরে ধীরে যান্ত্রিকরূপক প্রথাকে উল্লঙ্ঘন করে সাহিত্যের ইতিহাসে গীতিকবিতাকে সম্মানিত আসনসংগ্রহ করেদিন । আর রূপক তাঁর পরিচিত আচ্ছাদন ত্যাগ করে উত্তীর্ণ হয়ে গেল প্রতীকে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর শৈশব ও কৈশোরকালে রচিত কাব্যগুলিতে রূপক-কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু তাঁর প্রতিভায় গীতি কবির বৈশিষ্ট্য থাকায় তিনিও সার্থক রূপককাব্য রচনা করতে পারেন নি । গীতি প্রাধান্য বারবার তাঁর রূপক-কাব্যগুলিকে পূর্ণাঙ্গ হতে ব্যাহত করেছে । বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয় যে কবি রূপকপ্রিয় ছিলেন, মানসী, সোনার তরীর পর্ব অতিক্রম করে সেই কবি খেয়া গীতাঞ্জলি পর্বে সম্পূর্ণ-ভাবে প্রতীককে আশ্রয় করেছেন ।